পিরিয়ডের সময় নারীর সমস্যা

নাহিন আশরাফ

ঋতুস্রাব একটি নারী জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সুস্থ নারীর ঋতুস্রাব সাধারণত ১০-১৪ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় এবং ৪৫-৫০ বছর পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার হয়ে থাকে। প্রতিমাসেই ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত এবং প্রথম ২/৩ দিন একটু বেশি ও পরবর্তীতে দিনগুলিতে কম রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ সময় কম বেশি সবার তলপেটে ব্যথা করে। কিন্তু অনেকের এমন অবস্থা হয় যে বিছানা থেকে উঠতে পারে না। যা দৈনিক কাজকর্মে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাকে 'ডিসমেনোরিয়া' বলা হয়ে থাকে। গ্রিক শব্দ 'ডিস' মানে হলো কষ্টকর, 'মেন' মানে হলো মাসিক এবং 'রিয়া' মানে হলো প্রবাহ। অর্থাৎ 'কষ্টকর মাসিক প্রবাহ'। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে করা সমীক্ষা অনুযায়ী ৫০%-এরও বেশি নারী ডিসমেনোরিয়া'য় ভুগে থাকেন।

মনোয়ারা হাসপাতালের গাইনি বিভাগে অনেক ডিসমেনোরিয়া রোগিদের ভিড় দেখা যায়। যাদের মধ্যে বেশিভাগেরই বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছর। একজনের সাথে কথা বলে জানা যায় তিনি ঋতুস্রাবের পুরোটা সময়ই বিছানাতে কাটান, কোনো ধরনের কাজ করতে পারেন না। ব্যথানাশক ওষুধ খেতে হয়। তাই তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন এই সমস্যার সমাধান জানতে। আরেকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, তিনি মাসিকের ব্যথার কারণে পরীক্ষা দিতে পারেননি। এতো তীব্র ব্যথা ছিল কোনো ওষুধেই ব্যথা কমছিল না।

মনোয়ারা হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ নাসরিন সুলতানা বলেন, ডিসমেনোরিয়া দুই ধরনের হতে পারে। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন এন্ডোমেট্রিয়োসিস, লিয়োমায়মা এডিনোমাইকোসিস, ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড, ওভারিয়ান সিস্ট, গর্ভাশয়ের ভেতর লাগানো গর্ভনিরোধক সামগ্রী ইত্যাদি। এই সমস্যা সাধারণত কমবয়সীদের ক্ষেত্রে হয়। ঋতুমতী হওয়া থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি বয়সেও প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া হতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা সন্তান জন্মের পর এই যন্ত্রণা ক্রমেই কমে আসে। একে প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া বলা হয়। অন্যদিকে জননতন্ত্রের বিচ্যুতির ফলে যন্ত্রণা হলে সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া হতে পারে। সাধারণত ৩০-৪৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে এটি দেখা যায়। অনেক বছর ধরে নিয়মিত ও যন্ত্রণাবিহীন মাসিক হলে ক্রমে মাসিকে যন্ত্রণা হতে শুরু হয় ও ধীরে ধীরে তা বাড়তে পারে। সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন মাসিক অনিয়মিত হওয়া, রক্তস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মাসিকের মধ্যে কয়েকবার রক্তস্রাব হওয়া ইত্যাদি।

ডিসমেনোরিয়ার লক্ষণ: ১. ডিসমেনোরিয়ার ব্যথা তলপেট থেকে পিঠের দিকে যাবে ২. মাসিক শুরু হওয়ার দুইদিন আগে থেকেই ব্যথা শুরু হতে পারে ৩. মানসিক অস্থিরতা হওয়া ৪. স্তনযুগলে যন্ত্রণা হওয়া ৫. বমি ভাব ৬. মাথা ব্যথা ৭. শরীর ব্যথা করা ৮. দৈনন্দিন জীবনের কাজে বাধা

ডিসমেনোরিয়া কেন হয় তার সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়ার সাধারণত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জরায়ুর মাংসপেশির তিনটা জোন থাকে। সবচেয়ে ভেতরের জোন এন্ডোমেট্রিয়াম, যেখান থেকে ব্লিডিং হয়। তারপরের জোন মায়োমেট্রিয়াম, তারপরের জোন পেরিমেট্রিয়াম। ধরে নেওয়া হয়, এই ব্যথাটা এন্ডোমায়োমেট্রিয়াল জোনের ডিসফাংশনের জন্য হয়। সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার কারণ টিস্যুটি কিছুটা জরায়ুর আস্তরণের মতো কাজ করে তা এর বাইরে বৃদ্ধি পায়– ফ্যালোপিয়ান টিউব, পেলভিস এবং ডিম্বাশয়ে। মাসিকের সময় এই টিস্যুতে রক্তপাত হয়; এটি গুরুতর মাসিক ব্যথা, ভারী রক্তপাত এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। এটির কারণে অনেক সময় জরায়ুর অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। জরায়ুর বিকৃতিকে নির্দেশ করে এবং আপনার মাসিকের সময় তীব্র ব্যথার জন্য দায়ী।

সাধারণত চিকিৎসকরা লক্ষণ দেখেই রোগ শনাক্ত করে ফেলতে পারে। খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষা তখন করা হয়, যখন সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া বলে সন্দেহ করার কারণ থাকে। সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার জন্য বেশ কয়েকটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেগুলি হলো রক্তের টিসি, ডিএলসি, ইএসআর, হিমোগ্লবিন। ভিডিআরএল, ভেজাইনাল স্রাব পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা। হিস্ট-সালফিংগোগ্রাম এক্সরে, পেটের আল্ট্রাসাউন্ড ইত্যাদি।

দেশের প্রতি দশজন মেয়ের মধ্যে পাঁচজনই ডিসমেনোরিয়াতে আক্রান্ত। মাসিক চলাকালীন সময় তারা স্কুল-কলেজে যেতে পারে না। স্কুলে বেড়ে যায় অনুপস্থিতির সংখ্যা। তাই মাসিক শুরু হবার আগে থেকেই ডিসমেনোরিয়াতে আক্রান্ত নারীরা খুব আতঙ্কিত থাকে। এর প্রভাব তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। নির্দিষ্ট এই সময়ে অস্বস্তি, ক্রোধ, খিটখিটে মেজাজ থেকে শুরু করে মানসিকভাবে একদম ভেঙেও পড়তে পারে মেয়েরা। ডিসমেনোরিয়া সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় অনেকেই এই মানসিক সমস্যার কারণ বুঝতে পারে না এবং আরো বেশি অস্থির হয়ে যায়। তাদের আশেপাশে মানুষের সাথে সম্পর্কে প্রভাব ফেলে। গ্রামাঞ্চলে এখনো কিছু কুসংস্কার আছে যে, বিয়ে হয়ে গেলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ধারনার ফলাফল হয় ভয়ানক। দেখা যাচ্ছে, অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। বাল্য বিবাহের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা, মাতৃমৃত্যু ঝুঁকি, অপরিণত গর্ভধারণ, প্রসবকালীন শিশুর মৃত্যুঝুঁকি, প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, নারীশিক্ষার হার হ্রাস, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ কমে যাওয়াসহ নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

ডিসমেনোরিয়া'র সমাধান কখনো বিয়ে না। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। গাইনি বিশেষজ্ঞ নাসরিন সুলতানা বলেন, 'ডিসমেনোরিয়া'র প্রথম চিকিৎসা লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। অস্বাস্থ্যকর জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভিটামিন ই এবং মিনারেলের মতো ভিটামিনসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করার চেষ্টা করতে হবে এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে হবে। অ্যালকোহল, চিনি এবং ক্যাফেইন খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। দুগ্ধজাত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। মাসিক চলাকালীন সময় গরম পানি পান করতে হবে। মাসিকের সময় গরম পানি দিয়ে গোসল করা যেতে পারে। এতে কিছুটা আরামবোধ হবে। জরায়ুর পেশী শিথিল করতে বা পেটে ম্যাসাজ করতে হিটিং প্যাড ব্যবহার করা যেতে পারে। সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া'র চিকিৎসা সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া'র কারণের উপর নির্ভর করে। এর চিকিৎসায় সাধারণত হরমোন থেরাপি দিতে হয়। সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়াতে অনেক সময় সার্জারির প্রয়োজন হয়। এসময় প্রতিটি মেয়ের পাশে তার পরিবারকে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় আশ্বাসে রোগির মন থেকে ভীতি দূর করতে হবে এবং সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় পর্যাপ্ত কাউন্সেলিং লাগে। ডিসমেনোরিয়াকে কখনো ছোট সমস্যা ভেবে অবহেলা করা উচিত নয়। এর সঠিক চিকিৎসা না নিলে ভবিষ্যতে এটি আরো জটিল হতে পারে। নারীর প্রজননজনিত সকল সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এবং চিকিৎসা করাতে হবে।